শুভ লাভ ও একটি ফাঁদের গল্প

সসীম কুমার বাড়ৈ

মনু এসেছিল মেপে মেপে ঠিক দু'বছরের মাথায়। নিঃশব্দে অগোচরে। অথচ তার অদৃশ্য উপস্থিতি চিত্রালি টের পেত প্রতিনিয়ত। না দেখা মানুষটার একটা অবয়ব মূর্তি সে আঁকতে চেয়েছিল গত ছ'মাস ধরে। কিন্তু কোনভাবেই মূর্ত হয়ে ওঠেনি চিত্রালির কাল্পনিক মনু। এই তো সেদিন গনেশ কাকার মুখে বসে গেল মনুর মুখ। কাকা শ্বশুর গনেশ কাকা কোনদিন মনুসংহিতা পড়েছে বলে শোনেনি চিত্রালি। গনেশ কাকা কোর্টের কাজে বর্ধমান এসেছিল। গ্রামে ফিরে যাওয়ার পথে চিত্রালিদের বাড়ি এসেছিল দেখা করে যেতে। বস্‌লেন , চা খেতে খেতে বললেন- স্বামীর যত্ন আত্তি ঠিকঠাক করতো। বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরা স্বামীর অধীন হয়ে যায়। গণেশ কাকা নতুন কিছু বলেনি। চিত্রালির গনেশ কাকাকে মনুর মতো মনে হল। পাকা সাদা ঝাকরা চুল, টিটলো নাক, লম্বা গড়ন। বুলাদির সাবধান বানী প্রথম প্রথম শুনতে ভাল লাগত। অথচ বুলাদি একদিন হাসতে হাসতে বলল- ঘর আর কতদিন ফাঁকা রাখবে চিত্রা? বাবা মা'র কথা এবার একটু ভাবো । একটা নাতি পেলে ওঁরা কত খুশি হবে বোঝ? বুলাদি বোধ হয় জরায়ুর নিস্ফল কান্নার আঁচ পেয়েছে। কৃত্রিম বাঁধন ছাড়া মাঝে মাঝে স্বামী স্ত্রী তো উদ্দাম হয়-------তারা।

তবু যে কোন যাপটি বাঁধে না জীবন পোকা। এখন চিত্রালি স্পষ্ট দেখতে পায় মনুর মুখ। বুলাদির মুখে কোন পার্থক্য নেই। শ্বেত বস্ত্রে লম্বা চুলে ঋষি দর্শন মানুষটিকে। খানিকটা তাল গোল পাকাতে শুরু করে চিত্রালির ভাবনা। নারী পুরুষের শারীরিক ব্যবধান ঘুচে গেল? বুলাদিকে বড় দার্শনিক মনে হয় চিত্রালির। বুঝলি বউ, স্বামীকে শুরু দিলেই হয় না।সন্তান ধারণে অক্ষম মেয়েদের সংসারে ঠাঁই নেই। অবিবাহিতা ননদের কথায় শরীরের তৃপ্ত অনুভূতিগুলি একনিমেষেই উধাও হয়ে যায়। চিত্রালি অনুভব করে কম্পন এলেই হাড়েই বোধ হয় প্রথম আসে।

রঞ্জনের কথা। রঞ্জন চিত্রালির স্বামী। স্থানীয় কলেজে ইংরাজী সাহিত্য পড়ায়। বর্ধমানের শহরতলির নীলপুরে তাদের বাড়ি। জায়গাটা ঠিক শহর গ্রামের সীমানায়। ওপারেই খাঁটি গ্রাম। মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে দুরন্ত জাতীয় সড়ক। যৌথ উদ্দোগে তৈরী হয়েছে বাড়িটা। বাবার খানিক অবদান আছে, বাকীটা রঞ্জনের টাকায়। বুলা, চিত্রালি আর রঞ্জনকে নিয়ে ছোট্ট সংসার। বাবা মা'র খুব একটা আসা হয় না। চাষাবাদের ফাঁকে কয়েকদিনের অবসর। কয়েকদিনের জন্য ছেলের বাড়ি এলে ও দু তিন দিনের মধ্যে হাঁপিয়ে যায় তারা। জাতীয় সড়কের গুমগুম আওয়াজে রঞ্জনের বাবার মাথা ধরে যায়। শেষে গ্রামে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেই বাঁচে। এরকম রঞ্জনের বাড়িতে চিত্রালির বিয়ে হয়েছে। মেয়েরা যা যা চায় সবই আছে এখানে। সবকিছু ছাপিয়ে গিয়েছিল রঞ্জনের ভালোবাসাআর ব্যক্তিত্ব। প্রথম চমকটা অবশ্যই ছিল পণ না নেওয়া। রঞ্জনের মতো আগরী পাত্রের জন্য যে কোন বাবা পঞ্চাশ ভরি সোনা সঙ্গে অনুসঙ্গ দিতে পিছ পা হতো না। এটা হলো এমন যোগ্য পাত্রের নিম্নতম বাজার মূল্য। পাশের জেলার উৎকল পাত্রের দামটা একটু বেশী। হাই স্কুলের মাষ্টার হলেই কমপক্ষে নয়লক্ষ। এর পরেও পাত্র নিলামে উঠতে পারে। চিত্রালি বোঝে এসবের মানে। চিত্রালি পরে জেনেছে- রঞ্জনই তার বাবাকেএমন ওয়াক ওভার দিয়েছে। যদিও রঞ্জনকে লড়তে হয়েছে অনেক। বাবা মা'র স্রোতের বিরুদ্ধে। বাজারে রটে গিয়েছিল-পাত্রের খুঁত আছে তাই পণ নেয়নি। চিত্রালির গায়ে কাঁটা দেয় এখনও। তার বাবার স্থাবর-অস্থাবর সবকিছুর বিনিময়ে এমন পাত্র মিলতো? সেই রঞ্জনে না ভেসে পারা যায়! শরীরের রোমে রোমে সে পুঁতে দিয়েছে তৃপ্তির স্বাদ । বাথরুমে সাওয়ারের নীচে নগ্ন শরীরে ভেসে যায় চিত্রালি । স্তন, উরুসন্ধি বেয়ে গায়ের উত্তাপ মাখা ঝরনার জল গড়ায়। কতবার যে নিজের

নগ্ন শরীকে ভেনাস মনে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু শরীরে উত্তাপ আর মাখামাখি এখন শিথিল হয়ে এসেছে। স্পষ্টই জরায়ুর কান্না শুনতে পায় চিত্রালি–জারিত কর শুক্রাণু। দেড় বছরের মাথায় রঞ্জনের কথায় তাগিদ শুনতে পায় চিত্রালি– আহা, ঘরে একটা ফুটফুটে বাচ্চা থাকলে কি মজাইটা না হতো। রেডিও টিভির বুলাদিকে আর ভালো লাগে না চিত্রালির। কে শুনতে চায় বুলাদির জ্ঞানের কথা। বরং ভাবতে ভালো লাগে সেই ছবিটা–অসংখ্য লেজওয়ালা ব্যাঙাচির মতো শুক্রাণু পিলপিল করে ছুটছে জরায়ুর দিকে। কে পৌঁছাতে পারে সবার আগে। ডিম্বানুর শরীর ভেদ করে লেজ নেড়ে বলবে–ইউরেকা আমি এসেছি। শরীরে একটা গভীর অনুভূতি পেয়ে বসবে অনুরননের মতো। কিন্তু প্রতি মাসে এক ঝলক রক্তপাতে পাল্টে দিচ্ছিল কল্পনার ছবিটা।

ইদানিং রঞ্জনকে বড় ক্লান্ট মনে হয় চিত্রালির। কৃষ্ণসায়রের মেলা থেকে রঞ্জন মস্ত বড় একটা বাঁধানো শিবের ছবি কিনেছে। চিত্রালি তো হেসে খুন। যার ত্রিনাথ সেক্সপিয়ার সে কিনা কিনেছে নন্দী ভৃঙ্গীর গুরুকে। অট টু ডু অর নট টুডু-তে ভোগা রঞ্জনকে আগে কখনও দেখেনি সে। এবং অবধারিতভাবেই সেক্সপিয়ার হেরে গেলেন বোম ভোলানাথ শিবের কাছে। শিব সেক্সপিয়ারের ছবির জায়গা দখল করল। স্বয়ং শিব চিত্রালির দিকে তাকিয়ে। গোটা দুনিয়ার সাথে সাথে সমস্বরে ফিসফিসিয়ে বলল–ও মেয়ে তুমি বাজা?– চিত্রালি রঞ্জনের দিকে তাকাল অভিমানি চোখে–-রঞ্জন তুমি একবার অন্তত বোঝার চেষ্টা কর, বাচ্চা হওয়া না হওয়াটাই জীবনের সব কথা নয়। কে শোনে কার কথা, নির্বিবাদি মনু গাছের মগডালে কষ্টা পেয়ারা চিবিয়ে যাচ্ছে।রঞ্জনের মুখে দার্শনিক ছোঁয়া। বড় অদ্ভুত মনে হয় চিত্রালির-হিন্দুরা দার্শনিক হলেই মনু হয়ে যায় ভিতরে বাইরে।

(২)

মাল্টিপেক্স বলাই ভাল। ডাঃ কুন্তল চ্যাটার্জীর নার্সিং হোম কাম চেম্বার কাম ল্যাব কাম পলিক্লিনিক। সাথে যথারীতি ঔষধের দোকান। এখানে চিত্রালি প্রথম এলো। কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকতেই প্রাণ জুরানো ঠাণ্ডা। হলঘর ভর্তি একঝাঁক মহিলার কৌতুহলী চোখের ফ্লাসগান গিয়ে পড়ল চিত্রালির মুখে। রিসেপসন থেকে তাকে দেখিয়ে দেওয়া হলো তিন নম্বর ঘর। বোলতার চাকের মতো বনবন করছে ঘরভর্তি মহিলাদের গুঞ্জন। অনেকের সাথে পুরুষ সঙ্গীও আছে। চিত্রালির নম্বর আসতেই সিস্টার গাকগাক করে জিজ্ঞেস করল- নাম বলুন। বিয়ে ক'দিন হয়েছে? বিয়ে হলেই জৈবিক নিয়মেই বাচ্চা হওয়ার কথা। না আসা মানেই সমস্যা গোপনে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে একটা মেয়েকে। সেই গভীরতম গোপন জরায়ুর অনুভূতি এমন সর্ব সমক্ষে আলোচনা? চিত্রালি থতমত খেয়ে গেল সিস্টার ধমকে উঠল– আরে চুপ করে রইলেন কেন? এখানে যখন এসে পড়েছ, স্যার তোমার কোলে বাচ্চা এনে দেবেনই। কত জটিল কেস নস্যি করে দিলেন। সাক্ষাৎ ভগবান বুঝলে, ভগবান। চুপ করে থাকলে হবে, সমস্যা কি?

না, না আমি আর যাব না ওখানে। কেন , বলবে তো। না, আমি যাব না কিছুতেই ডাঃ চ্যাটার্জীর নার্সিং হোমে। চিত্রা, কারণটা বলবে তো। কেন ওরা তোমার সাথে অশালীন আচরন করেছে। অশালীন শব্দটা কট করে চিত্রার কানে বিঁধল। শালীনতা আর অশালীনতার একটা সীমারেখা হয়ত আছে। কিন্তু স্বেচ্ছা নির্বাসিত লজ্জা সরম কোন সীমানায় দাঁড়িয়ে বুঝতে পারে না চিত্রালি ।তার কানে বেজে ওঠে সিস্টারের ধমক–দাঁড়িয়ে রইলে কেন? সালোয়ার কামিজ খুলে নয় নম্বর বেডে শুয়ে পড়। শুধুমাত্র নয় নম্বর ছিটটা সদ্য খালি হলো। যন্ত্রের মতো সবাই বুক পর্যন্ত সাদা চাদর টেনে শুয়ে পড়ছে। নার্স, টেকনিসিয়ান পুরুষদের সামনে বে-আব্রু শরীর। টেকনিসিয়ান অবিকল পুরুষাঙ্গাকৃতি একটি যন্ত্র ঢুকিয়ে দিচ্ছে যোনিপথে। আঃ কি যন্ত্রণা। কাঁকিয়ে উঠেছিল চিত্রালি। ডঃ চ্যাটার্জী পাশে দাঁড়িয়ে

আল্টাসোনোগ্রাফির স্ক্রিণে দেখছিলেন। কোথায় লুকিয়ে আছে মরীরের অসম্পূর্ণতা। তিনি যন্ত্রনাকাতর গোগড়ানিতে বিরক্ত হলেন। নার্স যেন এমনটিই চাইছিলেন-আরে এত নড়াচড়া করে আদিখ্যেতা করছ কেন? স্থির থাকো, নইলে কিন্তু যন্ত্র খুলে নেব। চিত্রালি বেডের দু'পাশ শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরে কাঠ হয়ে গেল। ডাক্তার কৃত্তিম হাসি ঝুলিয়ে বললেন–প্লিজ বি রিলাক্সকড। বডি নরম করুন। চিত্রালি আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, শুনতে পাচ্ছে না। লজ্জা, ব্যথায় আর কান্নায় অনেক আগেই তো চোখ কান বুজে এসেছে। তার দেখার ক্ষমতা নেই-স্ক্রিনে ডিফেকটিভ ফ্যালোপিয়ান টিউবের ছবি। চঞ্চল শুক্রানুর নিষিক্ত না হতে পারার প্রাচীর। ডাক্তার বাবুর ব্যবস্থাপত্র–ছোট্ট একটি অপারেশনে মুক্ত হবে নিষিক্ত ডিম্বানুর ওমঘর। অথচ রঞ্জনকে কিছুতেই বুঝাতে পারছে না–হাত বাড়ালেই কত শিশু। অনাদর অবহেলায় বিড়াল কুকুরের সাথে খাবার ভাগ করে খায়। ঔষধ আর ছুরি কাঁচি দিয়ে জবরদস্ত্ি করে মা হওয়ায় আনন্দ কোথায়। রঞ্জন এখানে আদিম পুরুষ। সে ইদানিং জিন ও রক্তের অবিমিশ্রতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। নিজের রক্তের সন্ত্ান। চিত্রালি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ।আমি আর সহ্য করতে পারছি না এই শালীনতার অত্যাচার। রঞ্জন অবাক হয়ে বলল- চিত্রা, দিস ইজ পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট। হোয়াই ডু ইউ টেক ইট , আদার ওয়াইজ। বি সিরিয়াস।

ডাঃ চ্যাটার্জী সাকসেসফুললি অপারেশন করে ওভারিতে একটি পথ করে দিলেন। হ্যাঁ প্যাসেজ টু ওভারি। এখন নিয়ম সন্ত্ান উৎপাদনের অত্যাচার সহ্য করে যেতে হয় প্রতিরাতে। কিন্তু প্রতিবারই ঝলক ঝলক রক্তপাতে ঘোষিত হয় জরায়ুর ব্যর্থতা। আর বাড়ে ঔষধ ইনজেকসনের মাত্রা। শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যায়। কিন্তু যে শরীরের ধারণ ক্ষমতাই নেই তাকে সিরিঞ্জে ফুঁড়ে ফুঁড়ে আর কতটা ক্ষমতা দেওয়া যায়? শেষে ডাক্তার বাবু রঞ্জনকে ডেকে বললেন- ইন্ট্রা ইউটেরাইন ইনসেমিনেশন করলে সমস্যার সমাধান হবে। রঞ্জনের মাথায় এর কোন মান দাঁড়ালো না। কিন্তু সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে গেল একনাগাড়ে। ডাক্তার বাবু জ্ঞান থাকা রক্তমংসের শরীরে পেরেক পোঁতার মতো ঠুকে ঠুকে একটা যন্ত্র ঢুকিয়ে দিলেন। সিরিঞ্জের মাধ্যমে প্রসেসড সিমেন সরাসরি জরায়ুতে ঢেলে দিলেন। চিত্রালি চারপাশ ঘর অন্ধকার হয়ে এলো। কিন্তু নড়াচড়া যাবে না। এমন কি কষ্টে কাতরানোও যাবে না। তাহলে বানচাল হয়ে যেতে পারে সব প্রচেষ্টা।

চিত্রালির পরীক্ষা। শরীরের অনুভূতি বলে দিচ্ছে জরায়ুতে কেউ ঘাপটি মেরেছে। প্রেগ কালার কার্ডে ধরা পড়েছে মা হওয়ার যান্ত্রিক লড়াইয়ে সে পাশ করেছে। চিত্রালির একটা ভয় যে কাজ করেনি তা নয়। অন্যের চেহারার অভিব্যক্তি থেকে তার ভয়ের জন্ম। বাথরুম থেকে বিবর্ন মুখে যারা বেরয় তাদের দেখেই চিত্রালি এখন বুঝতে পারে প্রতিবারের মতো সেবারও ডাহা ফেল। দলা পাকানো কান্না গিলতে গিলতে তারা নার্সিং হোম ছাড়ে। মেয়েরা আরো চুপসে যায় নিজেদের মধ্যে। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে মনু। মনু ফিসফিসিয়ে বলে– এবারেও-------পারলে না!
কিন্তু চিত্রালি মা হয়ে বুঝিয়ে দিল, মা হওয়া নয় মুখের কথা।

(৩)

অভি এলো। তাকে আনার প্রতি মুহূর্তকে প্রচুর মূল্য দিয়ে কিনতে হয়েছে রঞ্জনকে। এতো খরচের পর----নিজেকে শূন্য মনে হয়েছিল। যদিও অমূল্য অভি এসেছে ঘরে। রঞ্জনের বাবা লুফে নিয়েছিল নাতিকে। উচ্ছল বৃদ্ধই প্রথমে রঞ্জনের ছেলেকে অভি বলে ডেকেছিল। রাজত্ব থাকলে প্রথম দিনেই হয়ত অভির অভিষেক হতো রাজত্বে। বাবা কেন তাকে অভি নামে ডেকেছিল তার ব্যাখ্যা ছিল না। হয়ত অভিষেক ঐশ্চর্য্যের বাজারে বৃদ্ধ দাদুর মনে একটা প্রভাব পড়েছিল। বাবা হওয়ার আনন্দেও পাশাপাশি রঞ্জনের খরচের অংকটা মাথার মধ্যে খচ্‌খচ্ করছিল বাবা তাকে ধমকে বলেছিল– আমি

কি মরে গেছি নাকি। দাদুর জন্য আমার চল্লিশ বিঘা জমির আয়েও চলবে না? বর্ধমানে পাঁচ বিঘা জমি থাকলে যেখানে সংসার চলে যায় সত্যিইতো রঞ্জনের চাকুরি আর বাবার সোনার গোলা জমিতে সংসারের স্বাচ্ছন্দ না থাকার কথা নয়। রঞ্জনের নিজেকে বোকা আর অপরাধী মনে হয়েছিল। ছোট্ট অভির জন্য বিশ্ব সংসার বাজি রাখা যায় তার কচি---কোচকানো নরম নরম হাত আর দুধে আলতা ঠোঁট সঞ্চারিত করেছির রঞ্জনের মধ্যে পিতৃত্বের প্রথম শিহরন। জঠরের গন্ধ মাখানো তুলতুলে শরীরে স্পন্দন ভুলিয়ে দিয়েছিল রঞ্জনের খরচের খচ্খচানি। কি এক আশ্চর্য সুখানুভূতি আচ্ছন্ন করেছিল তার সত্বাকে। অনুভূতিগুলো তার পুঞ্জীভূত হচ্ছিল দেহমনে।

জন্মের ষষ্ঠ দিনে অভির সারা শরীর নীল হয়ে গেল। সুখানুভূতি হল কর্পূরের মতো উদ্ধায়ী। কোনার বাড়ির প্রতিটি সদস্য ইতিমধ্যে বুঝে গেছে অভির কষ্ট হচ্ছে। ষষ্টীর দিনে অভি হযে উঠত অভিষেক, অভিনব, অভিলাস অথবা প্রমেথিউস। রঞ্জন চেয়েছিল একটা জ্যোৎসই গ্রীক নাম। বীর হয়ে ওঠার আগেই অভির ছোট্ট শরীর নীল হয়ে যেতে শুরু করেছিল। অভির ঠিকানা হাসপাতাল। মেডিক্যাল কলেজ হসপিটালের শিশু বিভাগে ঠাঁই পেয়েছে অভি। পুঁতি গন্ধময় পরিবেশ আর হাসপাতাল চত্বরে আস্তানা গাড়া একপাল কুকুরের চিল চিৎকারের মধ্যে অসহায় অভি শুয়ে আছে ইনটেনসিভ কেয়ারে। মাক্স মুখে নলের মধ্য দিয়ে তিল তিল করে অক্সিজেন যোগাচ্ছে জীবনীশক্তি। শিশু বিভাগে উপচে পড়া ভিড়। অধিকাংশের বেড জোটেনি। মায়ের কোলে অথবা মেঝে শুয়ে তারা। রঞ্জনের বাবাই প্রথম হুংকার ছাড়ল-এখানে মানুষ বাঁচে। পাশে দাঁড়িয়েছিল শ্যামল দাস, চিত্রালির বাবা। প্রথমে রস বুঝতে পারেনি বেয়াই মশায় কি বলতে চায়। শ্যামল দাসের আত্মীয়-স্বজন বাঁচলে এখানেই বাঁচে। মরলে এখানেই মরে। কোনদিন মনে হয়নি এখানে মানুষ বাঁচে না। সে বলল– কি বললেন দাদা?

আ ছো ছ্যা, দেখছেন না চারদিকে নোংরার পাহাড়। একটা শিশু এই পরিবেশে বাঁচে কি করে। ডাক্তার ,নার্স একটাও কাজ করে না এখানে। বাইরে প্রাকটিস করে আর মাস গেলে মোটা মাইনে গুনবে সরকার। বুঝলেন সবাই ক্যাডার, হাসপাতালতো নয়, এক একটা ক্যাডার পোষার জায়গা।
ক্যামল বাবু খানিকটা চুপসে গেল। সে রঞ্জনের দিকে তাকাল। রঞ্জন বাবার কথায় সমর্থন করে বলল– অভিকে এখানে রাখা যাবে না বাবা। কাল সকালেই রিলিজ করে কলকাতার নার্সিং হোম নিয়ে যাব। রঞ্জনের বাবা অবাক হলো– কাল সকালে কেন? এখনই ডাক্তারের সাথে কথা বল।

ডাঃ সুপ্রকাশ মন্ডল দেখছিল অভিকে। রঞ্জনের কথা শুনে তার চক্ষু চড়ক গাছ বলছেন কি? এই অবস্থায় বাচ্চাটাকে রিলিজ করে নিয়ে যাবেন? অবাস্তব, কোনো অবস্থায় ওকে রিলিজ করা যাবে না এখন। আমরা স্বেচ্ছায় ডিসচার্জ করে নিতে চাই।

আপনার সন্তান আপনি নিতেই পারেন। আমি একজন ডাক্তার, আমি কিছুতেই বাচ্চার নাক থেকে অক্সিজেন নল খুলে নিতে পারব না। একটা রাত আপনাদের কষ্ট করে এখানেই ওকে রাখতে হবে। রঞ্জনরা একান্ত অনিচ্ছায় ডেঁকি গেলার মতো মেনে নিল ডাক্তার বাবুর কথা। কিন্তু রঞ্জনের ম্াসতুতো দাদা ভজন ডাক্তার বাবুকে শুনিয়ে বলল– কিছু হয়ে গেলে দায়িত্ব কিন্তু আপনার। ডাক্তার মন্ডল কিছু না বলে শিশু ওয়ার্ডে চলে গেল।

ভজন সকাল ছ'টায় অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে হাজির। ডাঃ মন্ডল সারারাত ডিউটি করে সবে কোয়াটাওে গিয়েছে। তার আসতে দেরী দেখে ভজন প্রায় হুলুস্থূলু বাঁধাতে যাচ্ছিল এমন সময় ডাক্তার মন্ডল ফিরে এলো। তাকে দেখে ভজন চিল্লিয়ে উঠল– এই যে ডাক্তার বাবু, আমাদের পেসেন্ট ছাড়তে দেরী হচ্ছে কেন?

–বাচ্চাটাকে রিলিজ করে নেবেন?

– তার মানে? রঞ্জর অসহিষ্ণু।

–বাচ্চাটার কন্ডিশন স্টেবেল। অনেকটা ইমপ্রুভ করেছে। আমার ধারণা দিন তিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে যাবে। রঞ্জনের বাবা বিরক্তি মাখা সুরে বলল– আপনি আমার নাতিকে এই নরকের মধ্যে রেখে দিতে চান নাকি। ওকে আমরা ভালো জায়গায় চিকিৎসা করাবো। রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার মন্ডল বললেন–দেখুন মিষ্টার কোনার,আমার ধারণা আপনারা বাচ্চার সুচিকিৎসাই চান। চিকৎসায় কি কোনো ঘাটতি আছে এখানে? এটা ঠিক যে পরিকাঠামো আর পরিচ্ছন্নতায় আমাদের খানিকটা দুর্বলতা আছে। এসবের মধ্যে ও আমরা রোগীর সেবাটা কিন্তু করি। বাচ্চা ভাল আছে। জানি ধক্কল নিতে পারবে কিনা ভেবে দেখুন।

অ্যাম্বুলেন্সটা হাঁর বাজিয়ে আশি থেকে একশ কিলোমিটার বেগে ছুটছে কলকাতার দিকে। অ্যাম্বুলেন্সে রঞ্জন আর চিত্রালি। পিছনে স্করপিও গাড়িতে রঞ্জনের বাবাসহ সাত আটজনের দল। স্করপিও গাড়ির ড্রাউভারের আশি স্পীডে গাড়ি চালিয়ে পোষাচ্ছে না। অন্য সময় দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়েতে গাড়ির গতি থাকে একশো থেকে একশো কুড়ি। চক্‌চকে মসৃণ রাস্তায় উঠলেই হাত নিসপিশ করে তার । স্বপ্নের দেখা গাড়িটার মতো পাখনা মেলে দিয়ে উড়ে যেতে ইচ্ছা হয়। এই ড্রাইভারে জীবনে আর তো কোনো উড়ানের স্বপ্ন নেই।

অভিকে বুকের ওমের মধ্যে রেখে শুয়ে আছে চিত্রালি। মুখে না বললেও সে বুঝতে পারছে আগের দিনের চেয়ে অভির আস্থা ভাল। বুকের দুধ টেনে চুকচুক কওে খাচ্ছে। গতকাল সারাদিন এক ফোঁটাও দুধ খায়নি। টানার ক্ষমতাই ছিল না। ভার হয়ে আসা স্তনের মধ্যে টস্‌টস্ করছিল্। দু তিনবার টিপে ফেলতে হয়েছে। ধীরে ধীরে দুধের বোঁটা টানছে অভি। আধ বোজা চোখে দু'একবার তাকাচ্ছে। দৃষ্টি হয়নি এখনও। তবু চিত্রালি বুঝতে পারে ছোট্ট অভি মায়ের মুখ দেখতে চায়। বুকের ওমে গভীর হয়ে ওঠে মাতৃ অনুভূতি। চিত্রার গাল গড়িয়ে পড়ে জলের ফোঁটা।

চূড়ান্ত তৎপরতায় চিত্রালির কোল থেকে অভিকে প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অ্যাটেনডেন্ট আর নার্সরা। চিত্রালি বুঝে ওঠার আগেই ঘটে গেল ঘটনাটা। তার কানে একটা শব্দ ধরা পরেছে–থ্রি জিরো সেভেন। ডাক্তার আর নার্স দু'জন নার্স দেখছে অভিকে। ডাক্তার গম্ভীর গলায় বলল–ভেরি সিরিয়াস কন্ডিশন। বুকের মধ্যে ধরা করে উঠল। যদিও মন মানতে চাইছে না। অভি'র নীল ভাবটাওতো অনেক কমেছে। তাহলে ডাক্তার কেন বলছে অবস্থা ভাল নেই। চিত্রালি গায়ের মধ্যে ঠাণ্ডা কম্পন অনুভব করে।

কেমরি হসপিটালের এমারজেন্সি বিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে রঞ্জনের বাবা বলল–দ্যাখো, দ্যাখো ভজন হাসপাতাল কাকে বলে। কত টিপটাপ। কাউন্টারে ঠিকই লিখেছে কিলিংলিনেস ইস নেক্সট টু গড। এরকম হাসপাতালে অর্ধেক রোগ আপনা আপনি সেরে যায়। সরকারি হাসপাতাল নাতিটাকে মেরেই ফেলত। শ্যামল বাবু এমন হাসপাতাল আগে কখনও দেখেনি। একজন কেরানীর কি-ই বা আয় যে আত্মীয় স্বজনকে কেমরিতে চিকিৎসা করানো যাবে। শ্যামল বাবু উদাসীন ভঙ্গীতে স্বস্তিকা চিহ্নের দিকে তাকালো। শিল্পীর হাতে আঁকা স্বস্তিকা চিহ্ন। বাড়িতে আঁকা সিন্দুর গড়িয়ে পড়া যে চিহ্ন আঁকা হয় তার থেকে আলাদা। নীচে দেবনাগরি হরপে লেখা-শুভ লাভ। শ্যামল বাবু শুধু বুঝল–লাভ বরাবরই শুভই হয়।

সারাদিন ডাক্তার নার্স মিলে ছেলেটার কি যে চিকিৎসা করল চিত্রালির কিছুই বোধগম্য হলো না। সিনেমায় দেখা নার্সদের মতো তাদের হাঁটাচলা, ক্যাটক্যাট। শ্বেতশুভ্র সেবিকাদের ব্যাপার স্যাপার মাথার পাশ দিয়ে ফসফস করে বেরিয়ে গেল। অথচ ব্যাপারটা এমন নয় যে ডাক্তার নার্সরা তাদের পাত্তা দিচ্ছে না। বরং কিছু জিজ্ঞেস করলে ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ঝুলিয়ে উত্তর দিচ্ছে তারা। তবু

এই হালহকিকতে মফস্বল শহরের চিত্রালির মধ্যে একধরণের অস্তিত্বহীনতা বোধ থেকে অভিকে আরো বুকের মধ্যে টেনে নেয় সে। তার নিজের ও বিশ্বাস মায়ের ওমই সন্তানকে দিতে পারে জীবনীশক্তি। কিন্তু বিকেলেই অভি নিপেল টানা ছেড়ে দিয়েছে। বুকের মধ্যে যেন একটা পাথর চেপে আছে, অভির শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল । আর ফিরে এসেছে নীল ভাবটা। ছোট্ট অভি এখন অনন্তহীন গহ্বরে একা।

সিনিয়র ডাক্তার ডাঃ আদিত্য কেডিয়া এলেন, দেখলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিকে পাঠিয়ে দিলেন ভেন্টিলেশনে। চিত্রালি রঞ্জন প্রায় দর্শক। ডাঃ কেডিয়া চিত্রালি বা রঞ্জনের সম্মতির প্রয়োজন বোধ করলেন না। বড় হাসপাতালের এটাই রীতি। শুধু বুঝে নেওয়া গ্যাটের জোর আছে কিনা। সবার মুখ করে লক্ষ্য করে ডাঃ কেডিয়া শুধু বললেন উয়ি আর এক্সপ্লোরিং দি বেস্ট পসিবিলিটিস। রেস্ট অন দি অল মাইটি গড।

গ্লোসাইন আর নিয়নের আলোয় ভেসে যাচ্ছে গোটা হসপিটাল চত্বর। ওয়েটিংরুম থেকে বেরিয়ে অনেকেই হাসপাতাল লনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সবাই প্রায় মূর্তিবৎ। কথাবার্তা বিশেষ নেই । মুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ । এ নিয়ে পাঁচ দিন ভেন্টিলেশনে আছে অভি। রঞ্জনের বাবা একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে ফিরে গেছে বাড়ি। যাওয়ার সময় বলে গেছে– আমার যাবতীয় সঞ্চয় শেষ। একজন চাষীর কতটুকু নগদ সঞ্চয় থাকে। ভুলই বোধ হয় করে ফেললাম।

প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল বিলের পরিমান। রঞ্জনের বাবার সব হিসেব নিকেশ গুলিয়ে যাচ্ছিল হাসপাতালের মসৃনতায়। সে কি করে জানবে সুন্দরী নার্স, বিদেশে পড়া ডাক্তার আর নিয়নের আলোর এত দাম। একজন চাষীর নগদ সঞ্চয় তিন চার লাখই যথেষ্ট বেশি। নিয়নের প্রতিমুহূর্তেও দাম মিটানোর যে ক্ষমতা নেই তা সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল। মোহভঙ্গ মানুষটির নিঃশব্দ পালায়ন রঞ্জনকে আরো নিঃস্ব করে দিয়েছিল। মনে হয়েছে মহাশূন্যের অন্ধকারে তার দেহ ঘুরপাক খাচ্ছে। রঞ্জনের মতো মূর্তিবৎ অনেকেই ঘটি বাটি বিক্রীর হিসেব করছে।

রঞ্জন এভাবে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষনা করতে হবে আগে কখনও ভাবেনি। শ্যামল বাবুর দিকে তাকিয়ে সে বলেছিল –বাবা আমি শেষ হয়ে গেলাম। শ্যামল বাবুর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল চিত্রালি। মাথায় হাত বুলিয়ে সে সান্ত্বনা দিল– কাঁদিস না মা। আমি তো আছি। আমার দেউল গড়া মাঠটা বিক্রী করে দেব। দাদুভাই-ও জন্য এ করতে পারব না। বাবার কাঁধ দুটো আঁকড়ে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে চিত্রালি বলল- বাবা, বলছ কি? চিত্রালি জানে বাবা জীবনের চেয়েও ভালবাসে মাঠটাকে। শহরের উপকণ্ঠে জমিটার জন্য কম প্রোমোটার এসেছে্ বাবা বুকে অগলে রেখেছে জমিটাকে। বাবা নাকি মাটিতে কান পাতলে শুনতে পায় রণ ডঙ্কার শব্দ। কোন কালে এ মাটিতে যুদ্ধ হয়েছিল একবার। এইটাই নাকি শাহিদ্দান। মেহেরুনেছার প্রথম স্বামী শের আফগানের বধ্যভূমি। মাটিতে হাত দিতে কেমন আদ্র হয়ে ওঠে তার মন। মনে হয় ঘাতক কাশ্মিরী খাঁর তরোয়াল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পরছে মাঠে। শ্যামলবাবুর পূর্বপুরুষদের লাগানো আম-কাঁঠাল ছেয়ে আছে পুরো জমিটা। দেউলগড়া নামটা যে কেন হল শ্যামল বাবু জানে না। কিন্তু দেউলগড়া নামটায় কেমন উদাস হয়ে যায় মনটা। শ্যামলবাবুর বুকের মধ্যে হু হু করে ওঠে। কেমরির নিয়নের আলোর গ্রাসে ডুবে যায় এমন কতশত দেউলগড়া–শাহিদ্দানের মাঠ।

গত দু'তিন ধরে বাচ্চাটাকে মোটেই দেখতে দেওয়া হচ্ছে না। চিত্রালি পাগলের মতো ছুটে যাচ্ছে দরজার কাছে। সেখানে তাকে বলা হচ্ছে–ঢুকবেন না, স্যারের বারণ আছে। বাইওে থেকেই তো দেখতে পাচ্ছেন মনিটারের নীলরেখা। কাঁচের দরজা দিয়ে আবছা একটা সমান্তরাল রেখা দেখা যাচ্ছিল বটে। কিন্তু অভির সারা শরীর প্রায় সাদা কাপড় ঢাকা। দৌড়ে গিয়ে রঞ্জনকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে

বলল– অভিকে ওরা দেখতে দিচ্ছে না কেন?বল! কি বলবে রঞ্জন। নামকরণের দিনে অভি হতে পারত অভিষেক বা অভিনব। বা প্রমেথিউস। প্রমেথিউস বন্দীত্ব মুক্তির উপায় খুঁজে বের করেছিল। কিন্তু ছোট্ট অভির অতো শক্তি কোথায়? অভিতো চক্রবুহ্যে বন্দী। রঞ্জনের মাথায় বিদ্যুৎ বেগে অভির নাম বিবর্তিত হয়ে যায় অভিমুন্যতে। অভিমুন্য চক্রবুহ্য থেকে বেরোনোর রাস্তা জানে না। চিত্রালির মধ্যে মাতৃত্ব উথলে ওঠে। স্তন গড়ানো দুধে ভেজা সালোয়ার-কামিজ লেপ্টে যায় গায়ে। বুক চেপে ধরে চিত্রালি– অভি না খেলে আমার আর থাকল কি! ওরে অভিরে।

ঠিক সেই সময়ে একজন জুনিয়ার ডাক্তার নামছিল সিঁড়ি দিয়ে। দু'একবার অভিকে চেক করেছে। শ্যামল বাবু দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল– ডাক্তার বাবু আমার নাতি কেমন আছে?

–ভেরি মাচ ক্রিটিকাল।

–বাঁচবে তো?

ডাক্তার হাঁটতে হাঁটতে হাসপাতালের লনে বেরিয়ে এলো। এদিক- ওদিক ভাল করে দেখে বলল– আমি এখানে চাকুরি করি। প্রোটোকল মেনে আমার কিছু বলার নেই। বলতে পারেন খানিকটা বিবেকের দায়ে বলছি– বাচ্চাটাকে দু'দিন আগেই নিয়ে যেতে পারতেন। ক্যান উয়ি গিভ অ্যানিবডি লাইফ? প্লিজ আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। ডাক্তার বাবু হনহন করে এগিয়ে গিয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে।

শ্যামল বাবু উদ্ভ্রান্তের মতো ছুট লাগাল। ইনকিয়ারি কাউন্টারের দিকে। কাঁচের উপর জোরে থাপ্পর মেরে সুন্দরী রিসেপসনিস্টদের নজর কাড়ার চেষ্টা করল। গলার উপর তার নিয়ন্ত্রণ নেই। তারস্বরে চিৎকার করে বলল-বাচ্চাটাকে দেখতে দেওয়া হচ্ছে না কেন? পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ভজন, সে হাতা গোটাতে গোটাতে বলল, মামদা বাজি হচ্ছে,না। এক্ষুনি দেখতে দিতে হবে আমাদের পেসেন্টাকে। নইলে জ্বালিয়ে দেব। ভিতর থেকে দু'তিনজর সহায়িকা কিছু বলার চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। দেখতে দেখতে বাইরের অনেক লোক জড় হয়ে গেল। হৈ-হট্টগোলের মধ্যে ডাঃ কেডিয়াকে ডেকে আনা হলো। এসেই বললেন– বাচ্চাটার অবস্থা ক্রিটিক্যাল-বাট উয়ি আর হোপফুল। আপনারা কি চান ভেন্টিলেশনের নল বাচ্চাটার মুখ থেকে খুলে দিই। আর চোখের সামনে ছটফট করে মরে যাক। আপনারা কি চান সেটা আপনাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

রঞ্জন ধরা গলায় বলল-বাইরের থেকে স্পেসালিস্ট ফিজিসিয়ান এনে ওকে চেক করাতে দিন।

ডাঃ কেডিয়া খানিকটা হতচকিয়ে গেলেন। খানিকক্ষন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বললেন-ও-কে, লেট আস ডিসাইড ইন দিস রেসপেক্ট। বলেই গটগট করে চলে গেলেন লিফটের দিকে।

ঠিক আধঘন্টা পরে একজন অন্য ডাক্তার যমদূতের মতো নেমে এলো। হাতে একটি চিরকুটের মতো কাগজ। নিউজ বুলেটিন পড়ার মতো পড়ে গেল চিরকুটটি-অভি কোনার, সন অফ রঞ্জন কোনার দশ মিনিট আগে অর্থাৎ বারটা তের মিনিটে মারা গেছে। মে গড লিভ হিম হিন পিস। শ্যামলবাবু আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ডাক্তার বাবুকে এক ধাক্কায় চিৎ করে ফেলে দিল। হাতে ছিল সদ্য কেনা টিফিন কেরিয়ারটা। ক'দিন সেটায় বাইরের থেকে সবার জন্য খাবার এসেছে। সেটা দিয়ে ইনকিয়ারি কাইন্টারের কাঁচের সেপারেটর ভেঙ্গে ফেলল। ঝনঝন করে কাঁচের টুকরো আছড়ে পড়ল সাজানো মার্বেল মেঝেতে। ভাঙ্গা টুকরোর মধ্যে শ্যামলবাবু হতভম্ব মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। যা সব নিমেষে ঘটে গেল, তার কোনো কিছুর উপর শ্যামলবাবুর নিয়ন্ত্রণ নেই। সে যেন দাঁড়িয়ে থাকা স্থির জমাট বাঁধা মেঘ।

সোফার এক কোনে গুটিগুটি মেরে কুন্ডলি পাকিয়ে আছে চিত্রালি। তার বাকশক্তি নেই। কাঁদার ক্ষমতা নেই। চোখের সামনে অবছা অন্ধকারে সব কিছু চড়কির মতো ঘুরছে ভনভন করে। চক্রবুহ্যের চারদিকে ডাঃ কেডিয়া, মনু কেমরি হাসপাতাল, ছুরি হাতে সাইলকের মতো রথি মহারথি উল্লাসে

নাচছে অভিমুন্যকে ঘিরে। অবি যতবার পালাতে যাচ্ছে দরজা জানালায় পাতা নীল সূতোর ফাঁদে আটকে যাচ্ছে পা। পালাবার পথ নেই।

ভিতরের কাঁচটা তখনও অক্ষত ছিল। স্বস্তিকা চিহ্ন দুলে দুলে নেচে যাচ্ছে আনন্দে।

স্বস্তিকা চিহ্ন অবিরাম এক সুরে গেয়ে চলছে প্রিয় গান– শুভ লাভ। ওঁং শুভ লাভ। গোটা কেমরি হাসপাতালটা মিষ্টি সুরে স্বর মিলাচ্ছে স্বস্তিকা চিহ্নের সুরে।

সসীম কুমার বাড়ৈ, কোলকাতা, ২০ অক্টোবর ২০০৭